বাংলা সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের ক্রমবিবর্তন

মনিরা বেগম*

সারসংক্ষেপ : যেকোনো ভাষার লিখন ব্যবস্থার একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হলো বিরতিচিহ্ন। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষার তথা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ড় বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের বিবর্তন এবং সাহিত্যের শিল্পসৌকর্যে বিরতিচিহ্নের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের সাধারণ প্রবণতা অনুসন্ধান ও বিশে- ষণ করা হয়েছে।

ভাষাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন থেকেই লিখনরীতির উদ্ভব ঘটেছে। মূলত লিপি তথা লিখন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানবমনের ভাষা পেয়েছে বাহ্যিক অবয়ব। প্রত্যেক ভাষার লিখন ব্যবস্থায় রয়েছে বিরতিচিহ্ন, যা লিখনরীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থূল অর্থে ভাষার বিরতি-নির্দেশক যে কোনো সংকেতকে বিরতিচিহ্ন বলে। ভাষার মৌখিক রূপ ও ভাবকে লিখিতরূপে ভাষায় যথাসম্ভব প্রকাশ করতে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বিস্তৃতভাবে বলা যায়, বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আবেগ, দুঃখ, আনন্দ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া উপস্থাপনে বাক্যের মধ্যে বা শেষে যে বিরতি নেয়া হয় এবং লেখার সময় তা নির্দেশের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই বিরতিচিহ্ন (Punctuation Mark)। বাংলায় একে 'যতিচিহ্ন', 'ছেদচিহ্ন', 'বিরামচিহ্ন' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্নের ব্যবহার করা না হলে অর্থ অনুধাবনে সমস্যা হয়। যেমন : 'আপনি আসবেন না এলে রাগ করব'। এখানে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার না করার ফলে অর্থ অনুধাবনে সমস্যা হয়। অথচ বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করলে বাক্যটির অর্থ খুব সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অর্থাৎ 'আপনি আসবেন, না এলে রাগ করব'। বিরতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার না হলে পুরো বাক্যটি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে — 'আপনি আসবেন না, এলে রাগ করব'। এ থেকে লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্নের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া পায়।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধের গবেষণা-উদ্দেশ্য হলো বাংলা সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের ক্রম-বিবর্তন এবং সাহিত্যের শিল্প-সৌকর্যে এর ভূমিকা নিরূপণ করা। এক্ষেত্রে মূলত গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে বাংলা ভাষার কিছু সাহিত্যকর্ম এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিরতিচিহ্ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ আলোচনায় বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা

কথা বলার সময় ভাষিক এবং শারীরবৃত্তীয় কারণে মাঝে মধ্যে বিরতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সেই বিরতি তথা থামার আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। কখনো থামার মাত্রা দীর্ঘ, কখনো বা হ্রস্ব; গলার স্বরে থাকে বিচিত্র ভাব। কিন্তু কথা না বলে যদি লিখে বক্তার বক্তব্য, মনোভঙ্গি ইত্যাদি জানাতে হয়, তাহলে কথা বলার সময় যে মনোভঙ্গি প্রকাশ পায় লেখার মাধ্যমেও সেই একই মনোভঙ্গি প্রকাশে সচেষ্ট থাকতে হয়। তখনই প্রয়োজন হয় বিরতিচিহ্নের। এ থেকে বলা যায়, লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্নের ভূমিকা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। এটি বাক্যের শুধু অর্থই সুস্পষ্ট করে না, স্বরভঙ্গি ও বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠনও ব্যাখ্যা করে। হয়ত এ কারণেই বিরতিচিহ্নের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞার্থ পাওয়া দুষ্কর। অনেকের মতে, বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠন উপস্থাপন করাই হলো বিরতিচিহ্নের কাজ (Trask, 1999 : 253)। গবেষক পার্কসের (Parkes, 1993) মতে, বিরতিচিহ্নের দুটো প্রধান ভূমিকা রয়েছে : একটি ভাবগত ভূমিকা (rhetorical function) ও অপরটি ব্যাকরণগত ভূমিকা (grammatical function)। ভাবগত ভূমিকা হলো বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করা আর ব্যাকরণগত ভূমিকা হলো বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠন নির্দেশে সহায়তা করা। তাই বলা যায়, বাক্যের অর্থ ও সাংগঠনিক বর্ণনা উভয়ের জন্য যেসব চিহ্ন লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তা-ই বিরতিচিহ্ন।

বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার্থ না থাকায় লিখন ব্যবস্থায় এর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত বিতর্ক রয়েছে (Harris, 1995)। বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক সংজ্ঞার্থ প্রদান করেছেন। নিচে কয়েকটি উলে- খযোগ্য সংজ্ঞার্থ নিয়ে আলোচনা করা হলো :

সংজ্ঞার্থ-১ বাক্যের কোথায় স্বল্প বা পূর্ণ বিরতি, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বা পদের সুর (অর্থাৎ প্রশ্ন, বিস্ময়, নির্দেশ) ইত্যাদি বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সাধারণভাবে তাকেই বিরতিচিহ্ন বলা হয় (ভট্টাচার্য, ১৯৯৯ : ১০)।

সংজ্ঞার্থ-২ সাধারণত লেখায় ঝোঁক ও সুরের নির্দেশ করা হয় না — কিন্তু প্রশ্ন এবং হর্ষবিস্ময়াদি বিশেষ ভাব, যেখানে কণ্ঠস্বর বা সুরের পরিবর্তন সাতিশয় প্রবল, তাহা জানাইবার জন্য লেখায় দুই-একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; এবং স্বল্প বা দীর্ঘ বিশ্রান্ড়িও অর্থ গ্রহণের সুবিধার জন্য, ছেদ-চিহ্ন দ্বারা জানানো হয় (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৮ : ৭৫)।

সংজ্ঞার্থ-৩ The Act, practice or system of inserting various standardized marks or sign in written or printed matter in order to clarify the meaning and separate structural units : the division of written or printed matter by means of punctuation mark (Gove, 1957 : 1843).

সংজ্ঞার্থ-৪ The punctuation system of a language has two functions. Its primary purpose is to enable stretches of written language to be read in a coherent way; its secondary role is to give an indication of the Rhythm and colour of speech (Crystal, 1995 : 207).

এখানে সংজ্ঞার্থ-১-এ বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ চিহ্ন বাক্যে বিরতি এবং স্বরভঙ্গি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। এতে অর্থ সহজীকরণ এবং বাক্যের বিভিন্ন উপাদান পৃথকীকরণে বিরতিচিহ্ন যে ভূমিকা পালন করে, তা উলে-খ করা হয়নি। সংজ্ঞার্থ-২-এ স্বরভঙ্গি নির্দেশে বিরতিচিহ্নের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সংজ্ঞার্থ-৩-এ বিরতিচিহ্নের দুটো গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, লিখন বা মুদ্রণে বিরতিচিহ্ন মূলত দুটি কারণে ব্যবহৃত হয় — বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট করতে এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক উপাদানকে পৃথক করতে। সংজ্ঞার্থ-৪-এ বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বিরতিচিহ্নের দুটো উদ্দেশ্য : এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো লিখিত ভাষাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা যাতে তা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করা যায়। এর গৌণ উদ্দেশ্য হলো বক্তার স্বরভঙ্গি নির্দেশ করা। উলে-খিত সংজ্ঞার্থগুলোর আলোকে, আমরা বলতে পারি, কোনো কোনো সংজ্ঞার্থে বিরতিচিহ্নের কেবল সময়জ্ঞাপক মাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবার কোনোটিতে কেবল স্বরভঙ্গি ও অর্থ সুস্পষ্টীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে ইংরেজি সংজ্ঞার্থগুলোতে একটি বিষয়কে অত্যন্ড় গুর"ত্ব দেয়া হয়েছে, তা হলো বাক্যের বিভিন্ন উপাদানকে পৃথক করার ক্ষেত্রে বিরতিচিহ্নের ভূমিকা। উলে-খিত সংজ্ঞার্থগুলোর আলোকে আমরা বিরতিচিহ্নের কতগুলো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারি :

১. বিরতিচিহ্ন হলো কিছু সাংকেতিক চিহ্ন যা হস্ড়লিখন ও মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়।
২. এই চিহ্নগুলো লিখিত ভাষার অর্থকে সুস্পষ্ট করে তোলে।
৩. ভাষার বিভিন্ন সাংগঠনিক উপাদান তথা শব্দ, বাক্যাংশ, খ"বাক্য, বাক্য প্রভৃতিকে বিরতিচিহ্ন পৃথকীকরণ করে।
৪. ভাষা ব্যবহারকালে বক্তা যে মনোভঙ্গি প্রকাশ করে, বিরতিচিহ্ন তা যথাসাধ্য নির্দেশে সহায়তা করে।
৫. ভাষিক ও শারীরবৃত্তীয় কারণে বক্তা ভাষা ব্যবহারকালে যেভাবে বিরতি নেন, বিরতিচিহ্ন তা অনুসরণ করে প্রযুক্ত হয়।

অর্থাৎ বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, বিরতিচিহ্ন হলো এমন কিছু সাংকেতিক চিহ্ন যা লিখিত ভাষার অর্থকে সহজ ও অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট করে এবং লেখকের মনোভঙ্গি, বাক্যমধ্যস্থ বিরতি, ব্যাকরণিক উপাদান ও সংগঠন প্রভৃতিকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করে।[১]

বিরতিচিহ্নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আধুনিককালে প্রায় সব ভাষার লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। হঠাৎ করেই এ সব বিরতিচিহ্নের উদ্ভব ঘটেনি। এ সব বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষার লিখন ব্যবস্থার বিরতিচিহ্নসমূহ

প্রধানত ইংরেজি এবং এ অঞ্চলের নিজস্ব চিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। আবার ইংরেজি বিরতিচিহ্ন এসেছে গ্রিক ও লাতিন থেকে। পূর্বেই উলে-খ করা হয়েছে যে, বিরতিচিহ্ন হলো এমন কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন যা হস্ড়লিখিত ও মুদ্রিত রচনায় ব্যবহার করা হয়। ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত অভিধা 'Punctuation'-কে বলা যায় বিরতিচিহ্ন ব্যবহারবিদ্যা। 'Punctuation' শব্দটি এসেছে লাতিন 'Punctus' শব্দ থেকে। Punctus অর্থ Point অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ। ১৫ শতক থেকে ১৮ শতকের প্রথম পর্যন্ড় ইংরেজিতে এটি Pointing হিসেবে পরিচিত ছিল। 'Punctuation' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় ১৬ শতকের মধ্যভাগে হিব্র" রচনায়। ১৬৫০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে এর অর্থ বদল হয় (Safra, 1997 : 274)। ১৬ শতকের শেষের দিকে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার বিদ্যাকে কেন্দ্র করে দুটো ভিন্ন মতবাদ গড়ে ওঠে; যথা : বক্তৃতাবাদী মতবাদ (Elocutionary School) এবং বাক্যবাদী মতবাদ (Syntactical School)। বক্তৃতাবাদীদের মতে, ভাষায় বিরতি নির্দেশ করার জন্য বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। তাঁদের মতে, বিরতিচিহ্ন প্রধানত বক্তৃতা রচনাকালে বিরতি নির্দেশ করতে ব্যবহার করতে হবে। এখানে মূলত বক্তৃতার সহায়ক হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করা হতো, বিশেষ করে যখন কোনো সভায় উচ্চস্বরে কিছু পাঠ করার প্রয়োজন হতো। অপরদিকে বাক্যবাদীদের মতে, বিরতিচিহ্ন বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠন নির্দেশ করে। এঁদের মতে, বিরতিচিহ্নের কাজ বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সাংগঠনিক কাঠামো নির্দেশ করা। অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন উপাদান যেমন শব্দ, বাক্যাংশ, খ"বাক্য, বাক্য প্রভৃতিকে পৃথক করে থাকে। আধুনিককালে ইংরেজ লেখকরা স্বীকার করেন যে, বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভাষার সংগঠন তথা ব্যাকরণিক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করা। এছাড়া বিরতিচিহ্ন ভাষার বিরতিকাল এবং স্বরভঙ্গিকেও গুর"ত্ব দেয় (Allen, 2002)।

আধুনিককালে ইংরেজি ও অধিকাংশ পশ্চিমা ভাষায় বিরতিচিহ্নের ব্যবহার এসেছে মূলত খ্র"পদী যুগের গ্রিক ও লাতিন ভাষায় ব্যবহৃত বিরতিচিহ্ন থেকে প্রাচীন গ্রিক ভাষার নিদর্শন হিসেবে যে লেখা পাওয়া যায় তাতে লক্ষ করা যায় যে, বাক্যের মধ্যে কোনো পার্থক্যসূচক শূন্যস্থান না রেখেই তখন ধারাবাহিকভাবে লেখা হতো। অর্থাৎ সেগুলোর শব্দ ও বাক্যের মধ্যে কোনো ফাঁক রাখা হতো না। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকের কিছু উৎকীর্ণ লিপিতে বাক্যাংশকে মাঝে মাঝে উল-ম্ব চিহ্ন দ্বারা বিভক্ত করার নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের দিকে প্যাপিরাসের পাতায় যে প্রাচীন গ্রিক রচনা পাওয়া যায় তাতে প্যারাগ্রাফোস (Paragraphos) নামে একটি আনুভূমিক রেখা পাওয়া যায়, যা কোনো বিষয়ের প্রথম লাইনের নিচে টানা হতো। দিওনিসিওস থ্রাকস্ (৪৩০?-৩৬৭ খ্রি.পূ.) তাঁর *Grammatike Techne* গ্রন্থে ভাষার ব্যাকরণের ছয়টি অংশের কথা বলেন। এর মধ্যে একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হলো উচ্চস্বরে পাঠ

(Reading aloud); যার সাথে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার সরাসরি সম্পৃক্ত। বস্তুত উচ্চস্বরে পাঠ বিষয়টি সহজ ছিল না, কারণ সে সময় গ্রিক লিখন ব্যবস্থায় শব্দে শব্দে পার্থক্যসূচক ফাঁক রাখা হতো না। তাই উচ্চস্বরে পাঠ করার ক্ষেত্রে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করা হয় (Wingo, 1972)। এরিস্টটোলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) রচনায় এরও আগে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার পাওয়া যায়। বিরতিচিহ্নের ক্ষেত্রে এরিস্টোফেনের নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। এরিস্টোফেন (Aristophone) আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভাষার লিখনে কতগুলো চিহ্ন উদ্ভাবন করেন। গ্রিক বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগুলো প্রথম থেকে বর্তমান পর্যন্ড় টিকে রয়েছে। তিনি সাধারণত বাক্যের ছোট অংশের পর একটি চিহ্ন ব্যবহার করতেন, চিহ্নটি বাক্যাংশটির শেষ বর্ণের মাঝে বসাতেন, একে কমা বলা হয়। আবার তাঁর চেয়ে একটি বড় বাক্যাংশের শেষে কোলন হিসেবে একটি চিহ্ন বসাতেন, যা শেষ বর্ণের নিচে বসত। এছাড়া বাক্যের শেষ বর্ণের ওপরে পূর্ণচ্ছেদ হিসেবে একটি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। তখন লিখন ব্যবস্থার সব বর্ণ বড় হাতের (Majuscule letter)[২] হতো; তবু বাক্যের মুখ্য অংশসমূহ সহজেই শনাক্ত করা যেত (Lallot, 1989)। অষ্টম-নবম শতকের দিকে গ্রিক লিখন ব্যবস্থায় প্রশ্নচিহ্ন সংযোজিত হয়। বর্তমান কালের গ্রিক বিরতিচিহ্নের ব্যবহার পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রেনেসাঁর সময়। মূলত পনেরো শতকে ফরাসি ও ইটালিয়ান মুদ্রকদের দ্বারা গ্রিক লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্ন ব্যবহার অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক লিখনে উদ্ধৃতিচিহ্ন ও বিস্ময়চিহ্ন আরও পরে সংযুক্ত হয়।

প্রায় সব প্রাচীন রোমক উৎকীর্ণ লিপিতে শব্দকে চিহ্ন (Point) দ্বারা পৃথক করা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পর থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যেসব লাতিন দলিল ও রচনা পাওয়া যায় তাতে শব্দগুলি পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র থাকত। চতুর্থ শতকে রোমান প”িত ডোনাটুস ও ফ্যাসিওদোরাস এরিস্টোফেনস্-এর তিন-চিহ্ন পদ্ধতি (Three-point-system)-কে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। এটি তখন লাতিন বড় হাতের বর্ণ (Majuscule)-এর জন্য যথার্থ মনে করা হয়েছিল। সেই সময়ে লাতিন ভাষার লিখন ব্যবস্থায় শব্দে শব্দে কোনো ফাঁক রাখা হতো না এবং শব্দের মধ্যে কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা হতো না। কখনও কখনও বাক্যের শেষে একটু ফাঁকা রাখা হতো কিংবা কোনও চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হতো। অর্থাৎ নিয়ম সুনির্দিষ্ট ছিল না। চার শতকের শেষের দিকে সেন্ট জেরম বাইবেলের লাতিন অনুবাদ করেন। এ অনূদিত গ্রন্থটির নাম ‘Vulgate Bible’। এতে বিরতিচিহ্নের প্রথম যথার্থ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি লাতিন প”িত দিমোসথিনেস[৩] ও সিসেরোর[৪]-এর পা”ুলিপির ওপর ভিত্তি করে বাক্যাংশে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেন। এতে মূলত আলংকারিক বিদ্যাকে গুর”ত্ব দেয়া হয়েছে। সেন্ট জেরম রোমক সম্রাট শারলেম্যান[৫] এবং তাঁর উপদেষ্টা আলকুইনের[৬] কাছে পবিত্র গ্রন্থে বিরতিচিহ্নের অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তখন তাঁদের তত্ত্বাবধানে

বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের উন্নতি সাধিত হয় (Houston, 2013)।

সপ্তম ও অষ্টম শতকের দিকে লাতিন বড় (Majuscule) বর্ণগুলো ছোট (Minuscule)[৭] বর্ণে পরিণত হচ্ছিল। আইরিশ, অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং জার্মান লিপিকর অর্থাৎ যাঁদের লাতিন ভাষা হলো বিদেশি ভাষা, তাঁরা এ ভাষায় শূন্যস্থান রেখে শব্দগুলোকে লিখতে শুর” করেন। তেরো শতকে দেখা যায়, বাক্য শেষে একটু স্থান ফাঁকা রাখা একটি নিয়মে পরিণত হয় এবং অনুচ্ছেদ শেষে বা বাক্যের শুর”তে একটি বড় বর্ণ বসানো শুর” হয় (Clemens & Graham, 2007)। সম্প্রতি নিউ ক্যারোলিনে পা”ুলিপির যে নমুনা পাওয়া গেছে তা আনুমানিক ৭৮০ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এতে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারে আধুনিকতার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। বারো শতকের মধ্যে এটি সমগ্র ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়ে যায়। বাক্যে বিরতি দেখানোর জন্য লাতিন ভাষায় দুটো নতুন চিহ্ন সংযোজিত হয় — Punctue elevatus (√) Punctus inerrogativus (?)। এ চিহ্ন দুটো মূলত সংগীতের স্বরলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে বাক্যের বিরতি নয় বরং কণ্ঠস্বরের তারতম্য নির্দেশ করা হতো। বারো শতকে Punctus circumflexus (7) চিহ্ন elevalusএর সাথে যুক্ত হয়। দশ থেকে তেরো শতকের মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদের প্রার্থনা গ্রন্থ ও প্রার্থনা সংগীতের বিভিন্ন স্ড়বক শেষের দিক থেকে শব্দ ভাগ করতে হাইফেনের ব্যবহার শুর” হয়ে যায়।

বারো শতকের কাজের সাথে তুলনা করলে অন্ড়্য-মধ্যযুগে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার একটি আকস্মিক ঘটনা। এক্ষেত্রে প্যারিস, বলগনা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর উলে-খ করা হয়েছে। পনেরো শতকে আইনসম্বন্ধীয় কিছু ইংরেজি দলিল বিরতিচিহ্নের ব্যবহার ছাড়াই লিখিত হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ ও মার্কিন আইনজীবীরা এখনও দ্ব্যর্থতা পরিহার করার জন্য খুব কম বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেন। পনেরো শতকের অন্ড়্যমধ্যকালে ইতালীয় লিপিকাররা ধ্র”পদী লাতিন রচনাসমূহের অনুসরণে অন্যান্য মানবীয় বিদ্যায় বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। ১৪৫০ সালের দিকে তাঁরা অল্প বিরতি বোঝানোর জন্য Point, Punctus elevatus চিহ্ন ব্যবহার করতেন। এ সময় কোলনের ব্যবহারও করা হতো। এ সময় ভেনেসিয়ান সম্পাদক ও মুদ্রক এলডাস মেনুশিয়োস-এ বিরতিচিহ্ন ব্যবহার বিদ্যার উন্নতি সাধন করেন এবং ১৫৬৬ সালে তাঁর দৌহিত্র এলডো (Aldo) *System of Orthography* গ্রন্থে আধুনিক কমা, কোলন, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতিকে সংযুক্ত করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠন সুস্পষ্ট করাই বিরতিচিহ্নের প্রধান উদ্দেশ্য (Truss, 2004)। সতেরো শতকের শেষের দিকে বিভিন্ন বিরতিচিহ্ন যেমন : বিস্ময়চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, ড্যাশচিহ্ন প্রভৃতি সংযুক্ত হয়।

ষোলো শতকের শেষের দিকে ইংরেজ লেখকদের বিরতিচিহ্ন ব্যবহার দেখলে বোঝা যায়, তাঁরা দ্বিতীয় Aldo-কে অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁরা মতবাদের মতাদর্শে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বিরতিচিহ্ন ব্যবহারে বাক্যের সংগঠনকে গুর"ত্ব দেননি। জর্জ পুটেনহাম তাঁর *The Arte of English* (১৫৮৯) এবং সিমেন ডেইনস তাঁর *Orthoepia Anglican* (১৬৪০) গ্রন্থে একটি উপাদানের বিরতি বোঝাতে কমা, দুটি উপাদানের বিরতি বোঝাতে সেমিকোলন এবং তিনটির জন্য কোলন চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা মূলত বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের অস্থিরতা দূর করতে চেয়েছিলেন। বেন জনসন ১৬৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর *English Grammar* গ্রন্থে ইংল্যান্ডে প্রথম বাক্য কেন্দ্রিক বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ হলো ফ্রান্সিস বেকনের *Essayes*। তিনিও বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যের সংগঠনকে গুর"ত্ব দিয়েছিলেন। ১৭০৪ সালে রবার্ট মনটেথ এবং ১৭৯৫ সালে জে. রবার্টসন-এর বাক্যকেন্দ্রিক বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের তাত্ত্বিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে তাঁরা বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যের ব্যাকরণিক সংগঠন তথা — শব্দ, বাক্যাংশ, খ"বাক্য, বাক্য প্রভৃতির পৃথকীকরণ সম্পর্কে সুচিন্ড়িত মত প্রকাশ করেছেন[৮]। চূড়ান্ড়ভাবে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার পাওয়া যায় আঠারো শতকে। আভিধানিক হেনরি ওয়াটসন ফাউলার এবং ফান্সিস জর্জ ফাউলার *'The King's English* (১৯০৬) গ্রন্থে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্ড়ারিত আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে মূলত বর্তমান কালের ব্রিটিশ বিরতিচিহ্নের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন লেখকরা বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অনুসরণ করেন। তবে অনুসরণ সত্ত্বেও বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রিটিশদের চেয়ে আরও দৃঢ় নীতি প্রয়োগ করেন (Chelsea, 2017)।

বর্তমান কালে ইংরেজ লেখকরা যে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করে, তা মূলত সতেরো শতকের বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গরূপ। এর তিনটি গুর"ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো : শব্দের মধ্যে বা বাম পাশে খালি জায়গা রাখা, কোনো অনুচ্ছেদের প্রথম লাইন শনাক্ত এবং কোনো বাক্যের শুর"তে বা নাম বিশেষ্যের বা বিষয়-এর আগে বড় হাতের বর্ণ বসাতে হয়। বিরতিচিহ্নকে ইংরেজিতে points, stop ইত্যাদিও বলা হয়। বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের কিছু গুর"ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো — একটি পূর্ণবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বসে। কোলন চিহ্ন কোনো তালিকা, উদ্ধৃতি প্রভৃতি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সেমিকোলন চিহ্নটি কমা থেকে বেশি এবং ফুলস্টপ থেকে কম বিরতিকাল নির্দেশ করে। কমা হচ্ছে সবচেয়ে কম বিরতিকাল নির্দেশক চিহ্ন। ইংরেজি ভাষার লিখন ব্যবস্থার অন্যান্য বিরতিচিহ্নের মধ্যে রয়েছে — প্যারেনথিসিস, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, হাইফেন, ড্যাস এবং ঊর্ধ্বকমা। ইংরেজি বিরতিচিহ্নগুলোর ব্যুৎপত্তি নিচে দেখানো যেতে পারে (Safra, 1997 : 276) :

বিরতি চিহ্ন	ব্যুৎপত্তি
Comma	গ্রিক Komma থেকে এসেছে; অর্থ 'Piece cut off'.
Colon	গ্রিক 'Kolon' থেকে এসেছে; অর্থ 'limb', 'member'.
Period	গ্রিক 'Periods' থেকে এসেছে; অর্থ 'going round', Circut', 'Revolution'.
Exclamation mark	লাতিন 'Exclamare' থেকে এসেছে; অর্থ 'To call out'.
Question mark	লাতিন 'Quaestio' থেকে এসেছে; অর্থ 'To ask', 'seek'.
Question	লাতিন 'Quotus' থেকে এসেছে; অর্থ 'To mark the member of'.
Apostrophe	গ্রিক 'apostrephe in' থেকে এসেছে; অর্থ 'Of turning a way'.
Dash	উত্তর জার্মানীয় 'daskanam' থেকে এসেছে; অর্থ 'To beat'.
Bracket	লাতিন 'braca' থেকে এসেছে; অর্থ 'Mortise', 'breaches'.

আধুনিক বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতালীয় ও ফরাসি মুদ্রকদের অবদান অত্যন্ত উলে-খযোগ্য। মূলত পনেরো ও ষোলো শতকে তাঁদের মাধ্যমেই পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে বিরতিচিহ্নের প্রচলন শুর" হয়। ফরাসি ভাষার লিখন ব্যবস্থায় উদ্ধৃতি বোঝাতে ড্যাশ (—) চিহ্ন বা গিলমেট চিহ্ন (Guille-mets) (<< >>) ব্যবহৃত হয়। স্পেনীয় ভাষায় আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভাষায় উদ্ধৃতি উলে-খ করতে ইংরেজি উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ') অথবা ফরাসি উদ্ধৃতিচিহ্ন (<< >>) ব্যবহৃত হয়। জার্মান ভাষায় বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাদের প্রস্ড়াবিত ১৭৮১ সালের বিরতিচিহ্নের নিয়ম অনুযায়ী। এ লিখন ব্যবস্থায় সকল সম্পর্কিত উদ্ধৃতিচিহ্ন বোঝাতে দুটো কমা (" ") বা (>> <<) এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। মূলত গ্রিক বিরতিচিহ্নকে অনুসরণ করে র"শ ভাষার বিরতিচিহ্নের ব্যবহার শুর" হয়েছিল। আঠারো শতক থেকে এ ভাষায় পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার বিরতিচিহ্নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়েছে; যেমন : উদ্ধৃতি বোঝাতে জার্মান ভাষার উদ্ধৃতি চিহ্ন (" "), ফরাসি গিলমেট চিহ্ন (<< >>), ড্যাশ চিহ্ন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে জার্মানি লিখনে ইংরেজির অনুসরণে ড্যাশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিস্ময়বোধক চিহ্নের ও প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহার শুর" হয়।

ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষায় বিরতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না। মূলত সতেরো শতকে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষা দেবনাগরী লিপিতে লেখা শুরু হয় এবং তখন থেকে 'একদাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি'র (।।) ব্যবহার পাওয়া যায়। উনিশ ও বিশ শতকের আগে চিনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষার লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্ন সংযুক্ত ছিল না। বিরতিচিহ্ন ব্যবহার না

করায় চিনা লিখন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ড় দুর্বোধ্য। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে নিচের শিক্ষক সম্প্রদায় তাঁদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইংরেজির অনুসরণে চিনা লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করার জন্য জোর আবেদন জানান। এরপর পর্যায়ক্রমে চিনা ভাষা বিষয়ক, ও শিক্ষক নির্দেশনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিভিন্ন জনপ্রিয় রচনা বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশ করা হতে থাকে। ১৯১২ সাল থেকে চিনা লিখন ব্যবস্থায় ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে চিহ্ন গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের ইউরোপীয় ঋণ রয়েছে। উদ্ধৃতি বোঝাতে দুই উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) বা এল (L) আকৃতির চিহ্ন উদ্ধৃতির প্রথম ও শেষ বর্ণে (Characters) যুক্ত করা হয়। অন্যদিকে জাপানি লিখন ব্যবস্থায় কারিতেন (Kaeriten) এবং কুনতেন (Kunten) চিহ্ন দুটো দ্বারা যেকোনো রচনার অর্থ এবং ব্যাকরণিক সংগঠন সুস্পষ্ট করা হতো। এরপর পনেরো ও ষোলো শতকে ইউরোপীয় বিরতিচিহ্নের অনুসরণে তাঁরা বিরতিচিহ্নের আধুনিক ব্যবহার শুর“ করেন। এ সময় পূর্ণচ্ছেদ (Full point) ও কমার অনুকরণে তাঁরা <০> এবং < ˛ > এ চিহ্ন দুটো ব্যবহার করেন (Prasoon, 2015)।

বাংলা সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের ক্রমবিবর্তন

প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা ভাষার লিখন ব্যবস্থাতেও বেশ কিছু বিরতিচিহ্ন রয়েছে এবং এগুলো সাহিত্যে অত্যন্ড় গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিরতিচিহ্নগুলো ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের লিখনে নিজস্ব অবস্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে কিছু নিজস্ব ও অধিকাংশ ইংরেজি থেকে আগত। নিচে সাহিত্য থেকে কালানুক্রমে উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের ব্যবহারের ক্রম বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যেতে পারে :

প্রাচীনযুগের নিদর্শন চর্যাপদ যে সময়ে রচিত, তখন বাংলা ভাষার নিতান্ড় প্রারম্ভিক অবস্থা। তাই চর্যাপদের ভাষা ও লিখন ব্যবস্থা আমাদের কাছে অনেক অস্পষ্ট। সেই সময় বিরতিচিহ্নের আশা করা নিতান্ড়ই দুরাশা। চর্যাপদের লিখন বৈশিষ্ট্যে ‘একদাঁড়ি’ ও ‘দুই দাঁড়ি’ বিরতিচিহ্নের ব্যবহার পাওয়া যায়। এক দাঁড়ি বর্তমান কালের ‘কমা’ এবং দুই দাঁড়ি বর্তমান কালের ‘দাঁড়ি’র মতো ভূমিকা পালন করে। ‘একদাঁড়ি’ ও ‘দুই দাঁড়ি’র উদাহরণ (সূত্র : চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৩১) :

১. উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ (চর্যা-২৮, শবরপা)
২. টালত মোর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ (চর্যা-৩৩, ঢেণ্ঢনপা)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লিখিত নিদর্শন হলো *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এতে দেখা যায়, মধ্যযুগের লিখনেও প্রাচীন যুগের লিখনের মতো এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি প্রচলিত

ছিল। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* উদাহরণ (সূত্র : চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৩১) দেওয়া হলো :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকূলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোর আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঅ্যাঁ তাঁর পায়ে নিশিবোঁ আপনা ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলো পরাণী ॥

বাংলা ভাষায় আধুনিক যুগের শুর“ উনিশ শতক থেকে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা গদ্যের চর্চা ও লিখনরীতির ব্যাপক প্রচেষ্টা চলতে থাকে। উনিশ শতকের একবারে শুর“তে কথ্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। কেরীর *কথোপকথন* (১৮০১)-কে বলা হয় (বাংলা হরফে মুদ্রিত) চলতি ভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ। কেরী মূলত ইংরেজি বাক্যের বিরতিচিহ্নের বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহার করেছিলেন। এ দ্বিভাষিক বইটির এক পৃষ্ঠা ইংরেজিতে ও এক পৃষ্ঠা বাংলায় লেখা হয়েছে। ইংরেজির অনুসরণে এখানে কমাও ব্যবহৃত হয়। কেরীর *কথোপকথন* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তৎকালীন বাংলা ভাষার উদাহরণ দেওয়া হলো (সূত্র : সিংহ, ১৯৯৭ : ২৫) :

১. তোঁর বলদ গাই গোটা তিনচারেক বেচিয়া টাকা শোধ কর, আর কি।
মহাশয় তুই মা বাপ তোমার চরণ ছাড়িমু না
মহাশয় আপনি বিচার কর“ন হাল গর“
বিক্রি করিলে চলিবে কেমন করিয়া।
২. তোমার কি নিতে হবে হাটে।
আমার ভাই চাউল টাউল মেনে আছে, কেবল
শাক মাচ তরিতরকারি আর বৌ’র জন্যে একখানা
সাড়ী কিনিতে হবে।

১৮০১ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় রামরাম বসুর (১৭৫৭-১৮১৩) *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*। এটি *কথোপকথনের* পূর্বে প্রকাশিত হয়। তখনও বিরতিচিহ্নের তেমন প্রয়োগ হতো না। যা ছিল তা এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি। এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতেও এগুলি পরিলক্ষিত হয়। তবে সেগুলোকে ঠিক বিরতিচিহ্ন বলা যায় না। কারণ সেগুলি বাক্যের গঠন, বা শ্বাস-বিরতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মূলত রামরাম বসুই প্রথম সচেতনভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন — প্রাসঙ্গিক উদাহরণ (সূত্র : ভট্টাচার্য, ১৯৯৯ : ১৭) :

মাধব তীর্থের কাছে আছে সেই পথ।
তাহাকে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥
হাতী ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়া সেই স্থানে।
অল্প লোকে গেলেন ভরত তপোবনে ॥

তাঁর উক্ত গ্রন্থের প্রথমদিকে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে একটি করে দাঁড়ি দেখা যায়। একাদশ অনুচ্ছেদে গিয়ে শেষ দুটি বাক্যে তিনি দাঁড়ি ব্যবহার করেন। দ্বাদশ অনুচ্ছেদে প্রতিটি বাক্যের শেষেই তিনি একটি করে দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের শেষের কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রায় প্রতিটি বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, রামরাম বসুই প্রথম অর্থপূর্ণভাবে বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অনুচ্ছেদের শেষে দাঁড়ির সঙ্গে যুক্তচিহ্ন হিসেবে ড্যাশের ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনাপর্বের অন্যতম শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯)। তিনি তাঁর *বত্রিশ সিংহাসন* (১৮১৮) বইটিতে অনুচ্ছেদের শিরোনামের শেষে দাঁড়ির সঙ্গে ড্যাশ যুক্তচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের *প্রবোধচন্দ্রিকার* কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো (সূত্র: সিংহ, ১৯৯৭ : ২৬)। এখানে মূলত দাঁড়ি ছাড়া অন্য বিরতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি বললেই চলে।

> সে সর্ব্বনেশে গোশাতে হন[২] করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণ[২] যখন করে তখন ভয়েতে খোকাখুকিগুলর চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়ে ও ছর ছর করিয়া মুতিয়া ফেলায় আমার প্রাণক ধড়ফড় করে গা থর থর গর[২] ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস দি তবে ফর[২] করিয়া ফিরিয়া যায় আবার আপনিই ঘরঘর করিয়া আইসে।

বাংলা লিখনে বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায়ও অনুভব করেছিলেন। ১৮১৫ সালের আগে তাঁর *বেদান্তগ্রন্থ* ও *বেদান্তসার* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৯ সালের আগে তিনি এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর সহমরণ বিষয়ে *প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* রচনায় তাঁকে দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন ও সেমিকোলন ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে মাঝে দুই দাঁড়িও এতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও পরে ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* গ্রন্থে বিরতিচিহ্নের প্রয়োগে রামমোহন আরো সচেতন হয়ে ওঠেন। এখানে তিনি কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন ও প্রশ্নচিহ্ন ছাড়াও বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার করেন। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে তাঁর "পথ্যপ্রদান" রচনায় বন্ধনীচিহ্নের ব্যবহার করেন। এতে তিনি প্রথম বন্ধনী ও তৃতীয় বন্ধনীচিহ্ন ব্যবহার করেন। তাই বলা যায়, বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রকে রামমোহন রায় আরো সম্প্রসারণ করেন। তবে তাঁর রচনায় বিরতিচিহ্ন সম্পর্কে কোনো তত্ত্বগত বা প্রয়োগগত আলোচনা পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও মূলত বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের শৃঙ্খলাপূর্ণরূপ তৈরি করেছিলেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন বাংলা গদ্যের ছন্দ। উনিশ শতকে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে

বিদ্যাসাগরের অবদান অত্যন্ড় উলে-খযোগ্য। এক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাস (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) ও সুকুমার সেন (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) মত প্রকাশ করেন যে, বাংলা বিরতিচিহ্নের প্রথম উদ্ভাবকের ভূমিকা বিদ্যাসাগরের নয়, অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম নিয়মিতভাবে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। তবে সুকুমার সেন বলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম বিরতিচিহ্নের ব্যবহার করলেও বিদ্যাসাগর বাক্যতত্ত্ব অনুযায়ী এমনভাবে বিরতিচিহ্নের ব্যবহার করেছেন যাতে মূল কর্তা বা ক্রিয়ার সাথে দূরবর্তী পদের সম্পর্ক সহজে বোঝা যায়। বাংলা গদ্যকে সহজ, সরল ও গতিময় করে তুলতে তিনি বিভিন্ন ধরনের বিরতিচিহ্ন প্রয়োগ করেছিলেন। প্রখ্যাত সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৯১) মতে, বিদ্যাসাগরের রচনাবলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. অনুবাদ ও অনুবাদমূলক রচনা
খ. শিক্ষামূলক রচনা
গ. সমাজ সংস্কারমূলক রচনা
ঘ. মৌলিক রচনা।

বিদ্যাসাগর অনুবাদ ও অনুবাদমূলক গদ্য রচনার মাধ্যমে অনুবাদের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর প্রথম অনূদিত গ্রন্থ *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭)-এর প্রথম সংস্করণে বিদ্যাসাগর কেবল দাঁড়ি ব্যবহার করলেও গ্রন্থের দশম সংস্করণে (১৮৭৬) তিনি নানা রকম ইংরেজি অনুসৃত বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমদিকে তাঁর যে জড়তা বা দ্বিধা ছিল, পরে তাঁর অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। ক্রমে বিরতিচিহ্নের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত "বিধবা বিবাহ উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্ড়াব"-এ বিরতিচিহ্নের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের আবেগকম্পিত বেদনা শিল্প-সুন্দর রূপ পেয়েছে (সূত্র : চৌধুরী, ১৯৯৫ : ১৪৭) :

> একে কৃষ্ণচতুদর্শীর রাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত্য; তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা গগণমন্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এরূপ সংকটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। [*বেতাল পঞ্চবিংশতি*]
>
> হায় কি পরিতাপের বিষ! যে দেশে পুরুষজাতির দয়া নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদাস্য দ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক ধর্ম রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। ["বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্ড়াব"]

বেতাল পঞ্চবিংশতির বাক্যসজ্জায় বিদ্যাসাগর প্রথম বিরতিচিহ্নের নিয়মিত প্রয়োগ করেছিলেন। 'কমা' চিহ্নের প্রথম পদ্ধতিবদ্ধ ব্যবহার হলো তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *শকুন্ড়লাতে*। অবশ্য *বেতাল পঞ্চবিশংতি* পরবর্তী রচনাগুলোতে একই রীতিতে কমা-চিহ্নিত হয়। প্রতিটি বাক্যকে বিরতিচিহ্ন দ্বারা পৃথক করে নিলে তাঁর অর্থগ্রহণে সুবিধা — *বেতাল পঞ্চবিংশতি* রচনাকালেই বিদ্যাসাগর এ কথা অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, উচ্চারণ করার সময়ে একটি বাক্যের সমাপ্তিস্থলের আগেও আমাদের থামতে হয়। বিরতি লিখনের ক্ষেত্রে তা চিহ্নিত হলে অর্থগ্রহণ সহজ হয়। *শকুন্ড়লা* (সূত্র : চৌধুরী, ১৯৬) :

কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিপূর্ণ জলকমণ্ডল হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছে, কিছু উপশম হয়েছে?

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর বিরতিচিহ্ন বিশেষত কোলন, দাঁড়ি, বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন। যেমন : (*বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ১৯৯৯ : ১১৪ ও ১৮৩) :

কণ্টকবৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই হে! এ বড় মজার কথা। আমি তোমাকে ও আমার ত আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমার অবলম্বন করিলে কেন? শৃগাল অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল বাঃ! তুই ক্ষুদ্র, অতি নীচ। এই বেড়া বাত মহৎ, উহাতে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। [*শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ*]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার যে প্রবাহ অনুসৃত হচ্ছিল, সে ধারারই একজন নায়ক হয়ে ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে নাট্যকার হিসেবে। তিনি নাটকের সংলাপে প্রাণবন্তড়তা আনতে ইংরেজির অনুসরণে বিভিন্ন বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃত দুটি নমুনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন দত্ত তাঁর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোলন চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন, হাইফেন, বন্ধনীচিহ্ন প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন (দত্ত, ১৯৭৩ : ৪৮, ৫২, ৫৭) :

(ক) চৈতন। নব আর কালী যে আজ দেরী করছে, এর কারণ কি?
বলাই। আমি তা কেমন করে বল্‌বো? ওহে ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড নিতে চায়, আর ভাবে, আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্মই হবে না।
একেই কি বলে সভ্যতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(খ) গৃহিণী। আর তোঁরা দেখ্‌ছি একেবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েছিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণ শুতে আস্‌তো, হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে। ও ঠাকুরঝি, আজ দেখ্‌চি তোঁর ভারী আহ্লাদের দিন! দেখ, হয়তো তোঁর দাদা আজ আবার তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়।
একেই কি বলে সভ্যতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক

(গ) ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নোস্‌রে। তোঁর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্?
গদা —
গদা। আজ্ঞে এ-এ-এ ।
ভক্ত। এ পাজী বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, প্রথমাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্যারিচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) নামে যে উপন্যাস লেখেন, তাতে চলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এতে তিনি ড্যাশ চিহ্ন ও লিডার চিহ্ন ... ব্যবহার করেছেন। যেমন : (মিত্র, ২০১৭) :

বটলার সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। বর্তমান মাসে কত কর্ম হল, উল্‌টে পাল্‌টে দেখিতেছেন, নিকটে একটা কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব এক একবার সিস দিতেছেন — ... এক একবার দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন — এক একবার ভাবিতেছেন, আদালতের কয়েক অফিসে খরচার দরুন অনেক টাকা দিতে হইবে — টাকার জোটপাট কিছুই হয় নাই, অথচ টারম্ খোলাবার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্ম বন্ধ হয়। (*আলালের ঘরের দুলাল*)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বাংলা বিরতিচিহ্ন ব্যবহারে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, ড্যাসচিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার করেছেন। মূলত তিনিই প্রথম ড্যাশের আধুনিক প্রয়োগের সূত্রপাত করেন। যেমন (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৩ : ৩৩, ১২০) :

(ক) পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুরী মনে করিয়াছেন — না করবেন কেন; আমাকে ভালো মানুষের মেয়ে বইত আর ছোটলোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওরাঁ দশটা দেখেছেন — মানুষ চিনতে পারেন — কেবল এই বাড়ির পোড়ালোকেই মানুষ চেনে না।"

(খ) আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন ব্যক্তি নন, বাঙালি জীবনের একাধিক যুগপ্রবাহকে তিনি বহন করে ফিরেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে বাংলা বিরতিচিহ্নের প্রয়োগ বহুদূর অগ্রসর হয়। তবে বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের পরে রবীন্দ্রনাথই বাংলা বিরতিচিহ্নের প্রয়োগকে সর্বাধিক প্রসারিত করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীর বিবর্তন লক্ষ করলে বাংলা বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের ক্রমবিবর্তনটিও সহজে বোঝা যাবে। কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন, হাইফেন প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি বিরতিচিহ্নের যথার্থ ও সংগত প্রয়োগের শত শত দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় ছড়িয়ে আছে। নিচে কাবুলিওয়ালা গল্প থেকে নমুনা দেওয়া হলো (ঠাকুর, ১৩৫০ : ২২২-৩) :

(ক) উহাদের মধ্যে আরো-একটি কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখি, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না!"
বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে জন্ম হইতেই 'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু-মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

এসব উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গদ্যে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন, হাইফেন, ড্যাশ, প্রশ্নচিহ্ন প্রভৃতি বিরতিচিহ্নের সংগত প্রয়োগ করেছেন,

বিরতিচিহ্নের ব্যবহারকে তিনি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে বিরতিচিহ্নের সচেতন ও সতর্ক প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজশেখর বসু ও বুদ্ধদেব বসুর নাম উলে-খযোগ্য। মূলত বাংলা সাহিত্যের এসব কীর্তিমান গদ্য লেখকদের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে বিরতিচিহ্ন আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। বলা বাহুল্য, বিরতিচিহ্ন প্রয়োগে এঁদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের নিজস্ব অভির"চিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাহিত্যের শিল্পসৌকর্যে বিরতিচিহ্নের ভূমিকা

সাহিত্যের যেকোনো শিল্পরীতি প্রকাশের প্রধান অবলম্বন লেখকের রচনাশৈলী। বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রভাত থেকেই মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কীর্তিমান স্রষ্টাগণ নানাভাবে শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন তথা বিশেষ কলাকৌশল ও পদ্ধতি প্রকরণের সহযোগে অন"ড়রের সপ্রকল্পনার বাণীরূপ দিতে প্রয়াসী হন রচনাশৈলীর সাহায্যে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮)। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের আ"ড়রিক প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য সাহিত্য সজীব ভাবধারার বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটে এক যুগসন্ধিক্ষণে। অসামান্য প্রতিভাবান মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যসাহিত্যের অভ্য"ড়রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্রোতকে প্রবাহিত করে এক নবযুগের সূচনা করেন। তাঁর কাব্যসাহিত্যে বিরতিচিহ্নের ব্যবহারে বাংলা ভাষা গাম্ভীর্যে ও ভাবমাধুর্যে আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্যে* যে উদ্দাম কল্পনা, বর্ণনাশক্তি ও মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা মহাকবিরই উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ (দত্ত, ১৯৭৩ : ৩১৭) :

> সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
> লভিতে কি এই ফল। কেমনে ফিরিব, —
> হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
> শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সা"ড়্ত্বনাছলে
> সা"ড়্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
> 'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
> যবে রাণী মন্দোদরী, — 'কি সুখে আইলে
> রাখি দোহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
> কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
> হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
> হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
> এ পীড়া দার"ণ বিধি রাবণের ভালে?

এতে শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আশ্রয় করে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্যে যে ভাব ও ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশ করে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে

সেরূপ দৃষ্টান্ড় আর নেই। মধুসূদনই প্রথম বাঙালি যিনি শব্দের যাবতীয় বাহ্য মিলকে অগ্রাহ্য করে বিরামের বৈচিত্র্যের ও অনুপ্রাসের যমকের ধ্বনি লালিত্যের ওপর নির্ভর করে অসামান্যভাবে যতিচিহ্নের প্রয়োগে তাঁর সুদীর্ঘ মহাকাব্য রচনা করে শ্র"তিসুখকর করতে পেরেছিলেন। তাঁর মহাকাব্যে যতি ভাব নির্দিষ্ট হওয়াতে ভাষা কখনো দ্র"তগতিতে, কখনও বা স্খলিত গতিতে, আবার কখনও বা একেবারে স্থগিত হয়ে পাঠকের মনে বিচিত্রতার বিস্ময় সৃষ্টি করে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫২)। মধুসূদনের ছন্দকে সার্থকতা ও ভাবকে পূর্ণতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরতিচিহ্নের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এ কারণেই *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্য সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয় এবং মধুসূদনকে যুগ স্রষ্টার আসন দান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যকে বাংলা গদ্যসাহিত্যে এক অতুলনীয় মননশীল দুর্লভ সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পের কমল হিরের দ্যুতি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সাহিতকর্মে। আমাদের জীবন-সমুদ্রের পারে প্রতিদিন যে অসংখ্য ঘটনার ঢেউ আছড়ে পড়ে তাঁরই মধ্যে সংকট-সম্ভাবনার ইঙ্গিতময় বিদ্যুৎ বিভাস ফুটিয়ে তোলা যদি ছোটগল্পের দায়িত্ব হয়, প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশের মাহাত্ম্যকে আভাসিত করা যদি ছোটগল্পের অবশ্যকীয় উপাদান হয়, তবে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সফল ছোটগল্পকার (সিকদার, ২০০০)। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ছোটগল্প "পোস্টমাস্টার" অন্যতম স্থান দখল করে আছে। এতে নারী-পুর"ষের মধ্যবর্তী স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ মানব-মনের হৃদয় রহস্যের গভীরতল তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিরতিচিহ্নের অসাধারণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর লেখনীতে মানব মনের অসীম শূন্যতাবোধের ধারাবাহিক শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছেন। "পোস্টমাস্টার" গল্পের অংশবিশেষ (ঠাকুর, ২০১৬ : ৪০) :

> একদিন বর্ষকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ড় ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ড় দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ড় কর"ণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না — সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তর"পল-বের হিলে-াল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্ড়ূপাকার মেঘস্ড়র বাস্ড়বিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টামাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি — কেহ নিতান্ড় আপনার লোক থাকিত — হৃদয়ের সহিত একান্ড় সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তর"চ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল-বমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল-ীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্ড়ব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

গল্পের অংশবিশেষে দেখা যায়, দুইটি ড্যাস, চারটি সেমিকোলন ও চারটি কমা-র সাহায্যে তিনটি বাক্যের বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত হয়ে আছে। মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই সুদীর্ঘ তিনটি বাক্যকে দাঁড়ি ব্যবহার করে একাধিক বাক্যে বিভক্ত করতে পারতেন, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য মনে হয় স্বতন্ত্র। এক তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা পোস্টমাস্টারের মনকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে তুলছিল এবং অলস দুপুরের এই বিচিত্র মানস-অভিজ্ঞতার সাথে লেখকও ছন্দ মিলিয়ে আপন মনে ধীর লয়ে পদচারণা করে চলেছেন। মনের এ অব্যক্ত ভাবকে ভাষায় যথাযথভাবে ধরে রাখার জন্য লেখককে দীর্ঘায়িত বাক্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। একাধিক কমা ও সেমিকোলনের ক্ষণিক বিরতিতে, তার মৃদু আঘাতে মনের ভাবতরঙ্গ যেন ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে আবার পরবর্তী চিন্তা-অনুভবের স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে — মধ্যপথে তার আকস্মিক পূর্ণচ্ছেদ আসেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলোতে পরিচ্ছেদ বা বিরতি ব্যবহারের ফলে গল্পকে হয়ত একটানা সময়সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারেননি, কিন্তু তা কখনোই পাঠকচিত্তে কোনো বিন্যাসগত শিথিলতার প্রতীতি আনে না, বরং ভাববস্তু তথা জীবনবোধের অখন্ডতাজনিত এক সংহত নান্দনিক আবেদন জাগিয়ে তোলে (চৌধুরী, ১৯৯৭)।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে যিনি বনফুল নামে খ্যাতিমান লেখক হিসেবে সুপরিচিত; তাঁর প্রতিটি লেখায় অভিনবত্ব ও নতুনত্বের ছাপ পাওয়া যায় বিষয় নির্বাচন ও চরিত্র সৃষ্টির সৃজনশীলতায় (সিকদার, ১৩৭)। তাঁর লেখনীতে মানবজীবনের বিচিত্রতা ও ঘটনার বর্ণনায় বাক্য বিন্যাসে নতুনত্ব দেখা যায়। তাঁর "মানুষের মন" গল্পের অংশবিশেষ (মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০ : ৩৮) :

> উন্মাদের মতো পরেশ ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল — হ্যালো — শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো — হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই —বুঝলেন — হ্যালো — বুঝলেন — আপত্তি নেই — আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগ্গির আসুন — আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন —

বনফুলের এ লেখনীতে জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার বর্ণনায় যে অভিনবত্বের কৌশল, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর বাক্য রচনায় বিরতিচিহ্নের শৈল্পিক ব্যবহারও অন্যতম দাবিদার। ফলে সৃষ্টিপ্রাচুর্যে ও প্রকরণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বনফুলের কথাসাহিত্য অত্যন্ড় উজ্জ্বল। বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। পরিচিত অভিজ্ঞতার প্রায় সর্বস্ড়রে জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে একেবারে এর গভীরতম শ্বাস পর্যন্ড় অশেষ কৌতূহল নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে শিল্পকর্মে তা প্রকাশ করার বিরল ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। মূলত তাঁর ভাষা ব্যবহারের অসাধারণ ক্ষমতা সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই ভাষার বিরতিচিহ্ন ব্যবহারও তাঁর শিল্প সৌন্দর্যের অন্যতম দাবিদার। যেমন — তাঁর "নিরুদ্দেশ যাত্রা" গল্পের অংশবিশেষ প্রসঙ্গত উলে- খ করা হলো। (ইলিয়াস, ২০১৬ : ১৭)

> 'আম্মা, ছবি দেখতে যাচ্ছো?' 'ও মা, তুই ঘুমোসনি এখনো?' শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আম্মা মিষ্টি করে তাকাতো, 'যাও বাবা ঘুমোও, এসব বড়োদের ছবি, তোমাদের দেখতে নেই।' তখন রূপমহলে কেবল বাঙলা ছবি চলতো। আম্মা আমাকেও নিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, 'সেতু' ছিলো একটা ছবির নাম, 'সংসার', 'নিয়তি', 'বাবলা', আরো সব কি নাম, মনে নেই। আব্বা একটু একটু রাগ করতো, 'এসব ছবি তোমাদের জন্যে নয়, তোমাকে "টারজান" দ্যাখাবো।'

এখানে দেখা যায়, তাঁর লেখায় বিরতিচিহ্নের অসাধারণ ব্যবহারে গল্পের চরিত্রের মানুষগুলো হয়ে ওঠে জীবন্ড়। এর ফলে লেখকের চিন্ড়ার স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যের পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, সাহিত্যের শিল্প ও সৌকর্যে বিরতিচিহ্নের ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

বাংলা বিরতিচিহ্নের অপপ্রয়োগ

বাংলা ভাষার লিখন ব্যবস্থায় বিরতিচিহ্ন অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারপরও অনেক সময়ই বাংলা লিখনে বিরতিচিহ্ন প্রয়োগে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্য দেখা যায়।[৯] এক্ষেত্রে সেমিকোলন (;), হাইফেন (-) ও কোলন (:) চিহ্নগুলোর প্রয়োগ উল্লেখ করা যায়। বাংলা ভাষায় বিরতিচিহ্ন সেমিকোলনের আকৃতি ও ব্যবহার দুটোই ইংরেজির অনুকরণে এসেছে। সাধারণত বাক্যের অংশবিশেষ যখন কমার চেয়ে বেশি বিরতিকাল নির্দেশ করা হয়, তখন সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝির আগে মৌলিক বাংলা রচনায় সেমিকোলনের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। এরপরও বহুকাল যাবৎ সেমিকোলনের ব্যবহার ছিল অনিয়মিত এবং অনির্দিষ্ট। গত একশো বছরে অবশ্য অন্যান্য বিরতিচিহ্নের মতো সেমিকোলনের প্রয়োগেও কিছুটা যুক্তি ও নিয়মের বন্ধন লক্ষ করা গেছে। তবে এখনও যে, এর প্রয়োগরীতি সুনির্ধারিত হয়ে গেছে, এ কথা বলা যায় না। যথোচিত কারণে এবং ঠিক ক্ষেত্রে সেমিকোলন ব্যবহার করা গেলে লেখকের বক্তব্য সুচারুরূপে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। যদি একটি বাক্য অর্থবোধের জন্য পরের বাক্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়, তাহলে প্রায়ই সেমিকোলনের প্রয়োজন হয় না। নিচের বাক্যগুলিতে সেমিকোলন অসংগত :

> আমাদের ট্রেন আসতে তখনও অনেক দেরি; আমরা টিকিট ঘরের পাশের কামরায় গিয়ে বসলাম।

এই আলোচনা থেকে এটাও বোঝা গেল যে অনেক লেখক অযৌক্তিকভাবে সেমিকোলন ব্যবহার করেন। দাঁড়ি বা কমার জায়গা যেমন সেমিকোলন নিতে পারে না, তেমনি সেমিকোলনের জায়গায় দাঁড়ি বা কমার প্রয়োগও ঠিক নয়। প্রসঙ্গত আরও কয়েকটা উদাহরণ নিম্নরূপ :

> সব আলোর রং এক নয় এই কথাটা বুঝতে হবে, কোনো আলো লাল, কোনোটা নীল,

কোনোটা সবুজ, আর কোনোটা হলুদ।

এ উদাহরণে পরিষ্কার দুটি বাক্য আছে। তবে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। ওই উদাহরণে 'বুঝতে হবে'-র পরে চাই সেমিকোলন — এ থেকে বোঝা গেল, দাঁড়ি বা কমার জায়গা যেমন সেমিকোলন নিতে পারে না, তেমনি সেমিকোলনের জায়গায় দাঁড়ি বা কমার প্রয়োগ ঠিক নয়। তাই সেমিকোলনের ভুল বা অসংগত প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হাইফেনের মাধ্যমে দুই বা এর অধিক শব্দ সংযোগ করা হয় এবং এক লাইন থেকে অন্য লাইনে শব্দের পৃথকীকরণ দেখাতে ব্যবহৃত হয়। বাংলা হাইফেনের যথাযথ ও অর্থানুযায়ী প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের সময় থেকেই শুর" হয়েছে বললে ভুল হবে না। ক্রমে রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের রচনায় হাইফেন একটা গুর"ত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়। আধুনিককালে অনেক লেখকের প্রয়োগে যথেষ্ট যত্নবান হতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও হাইফেনের ব্যবহারে দ্বিধা ও সংশয় যথেষ্ট। অনেকের রচনায় দুটি শব্দ হাইফেন যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেকের রচনায় তাদের হাইফেনহীন সমাসবদ্ধ শব্দ হিসেবে দেখা যায়। 'হালচাল', 'ছাত্রজীবন', 'জীবনধর্ম', 'জীবনযাত্রা' প্রভৃতি শব্দকে বাংলায় হাইফেন ছাড়াই লেখার রীতি। তবে এগুলোকে লিখতে হবে পৃথকভাবে নয়, সমাসবদ্ধ শব্দ হিসেবে। অন্যদিকে, 'পথে-বিপথে', 'তাল-বেতাল', 'আদর-আপ্যায়ন', 'জীবিকা-উপার্জন' প্রভৃতি শব্দে হইফেনই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে কেউ কেউ যে 'তাল বেতাল', 'পথে বিপথে', 'জীবিকা উপার্জন লেখেন না এমন নয়। তবে প্রয়োগ-বাহুল্যের বিচারে হাইফেনের দিকেই পাল-া ভারি বলে মনে হয়। তবু হাইফেনের প্রয়োগে দ্বিধা ও মতভেদ পুরোপুরি এড়ানো কঠিন। ব্যক্তিগত অভ্যাস ও র"চি এখানে অনেকটাই সক্রিয়। এছাড়া বাংলা ভাষায় বিরতি চিহ্নগুলোর মধ্যে কোলন (:) অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। অসতর্কতার কারণে অনেকে কোলনের স্থলে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহার করেন। যেমন—

ভাষা প্রধানত দুই প্রকার, যথাঃ মৌখিক ও লিখিত।

এখানে 'যথা'-এর পরে কোলন চিহ্নের বদলে বিসর্গ ব্যবহার করা হয়েছে — যা অসংগত। মূলত বিরতিচিহ্নের অপপ্রয়োগ ঘটলে ভাষার লিখন ব্যবস্থা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। বিরতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহারে বাংলা ভাষার লিখন ব্যবস্থা আরো সুপ্রণালিবদ্ধ হবে — এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে লিখনের ক্ষেত্রে একটি অতীব গুর"ত্বপূর্ণ অংশ হলো বিরতিচিহ্ন। লিখনকে সুশৃঙ্খল ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে বিরতিচিহ্নের রয়েছে কার্যকর ভূমিকা। এ আলোচনায় আমরা বিরতিচিহ্নের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইংরেজি এবং গ্রিক-লাতিন

লিখনে ব্যবহৃত বিরতিচিহ্নকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। কেননা বাংলায় বিরতিচিহ্ন মূলত পাশ্চত্য ধারণা, বিশেষ করে ইংরেজিতে ব্যবহৃত বিরতিচিহ্নকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। গোটাকয়েক চিহ্নের কথা বাদ দিলে লিখনে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের নীতি এখনও সুস্থির হয়নি। বহু লেখক বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব অভির"চিকেই প্রাধান্য দেন। বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠা করা হলে এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলা হলে ভাষার লিখনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও সুপ্রণালিবদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। সাহিত্যে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পের দাবি ও পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে তিনটি বিষয়ে সুপারিশ করা হলো :

ক. সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের প্রয়োগ অনেক সময়ই অনুসরণীয়। তাই সাহিত্যে বিরতিচিহ্নের প্রয়োগ যাতে অনিবার্য হয় অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।

খ. সাহিত্যে ভাব ও শৈল্পিক উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করে বিরতিচিহ্নের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। যেহেতু বিরতিচিহ্ন ব্যবহারের অলঙ্ঘনীয় কোনো নিয়ম নেই। তাই সাহিত্যে এর স্বাধীনতা অনায়াসেই ভোগ করা যায়, তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখা উচিত শিল্পের দাবি যেন ক্ষুণ্ন না হয়।

গ. সময়ের সাথে সাথে বিরতিচিহ্ন ব্যবহারেও পালা বদল হয় এ পালা বদলকে শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করার জন্য ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন। বাংলা লিখনে বিরতিচিহ্ন নিয়ে এখনও পর্যন্ড় কোনো উলে- খযোগ্য গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। তাই এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

টীকা

১ প্রবন্ধের এই অংশে গরেষকের এম.এ শ্রেণির থিসিস হতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২ হাতের লেখায় বা মুদ্রণে বড় হাতের বর্ণকে Majuscule letter বলে। উদাহরণ : A, B, C ইত্যাদি। একে Capital letter বলা হয়।

৩ Demosthenes (৩৮৪? - ৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন একজন গ্রিক বক্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তি।

৪ পুরো নাম Marcus Tullivus Ciccro (১০৬-৪৩ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন রোমান রাজনৈতিক নেতা ও বক্তা।

৫ শারলেম্যান (৭৪২-৮১৪) ছিলেন রোমান সম্রাট। তিনি "Charles the Great" নামেও পরিচিত।

৬ আলকুইন (৭৩৫-৮০৫ খ্রি.) ছিলেন একজন ব্রিটিশ প"িত। তিনি সম্রাট শারলেম্যানের উপদেষ্টা ছিলেন।

৭ সাধারণত ছোট হাতের বর্ণকে Manuscule letter বলে। উদাহরণ : a, b, c ইত্যাদি। একে Lower-case letter ও বলা হয়।

৮ সূত্র:ইন্টারনেট <http://www.physics.ohio-state.edu/~wilkins/writing/Resources/essays/punctuation_hist.html> [Saturday, 22-Sep-2004 06:16:49]

৯ প্রবন্ধের এই অংশ রচনায় (১৯৯৯) *তিষ্ঠ ক্ষণকাল : বাংলা বিরামচিহ্ন ও অনান্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড) গ্রন্থটির প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, ওয়াকিল, ১৯৯৮। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি।

ইলিয়াস, আখতার-উজ্জামান, ২০১৬। *রচনাসমগ্র-১*, মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ১৯৯১। *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৩। *বঙ্কিম রচনাবলী*। প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ; ঢাকা : সাক্ষরতা প্রকাশনা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৮৮। *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা : রূপা সংস্করণ।

চৌধুরী, শ্রীভূদেব, ১৯৯৫। *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

চৌধুরী, গোপিকানাথ রায়, ১৯৯৭। *রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প*, সাহিত্য লোক : কলকাতা।

দত্ত, মাইকেল মধূসূদন, ২০১৫। *মধূসূদন রচনাবলী*। হরফ প্রকাশনী : কলকাতা ।

দাস, শিশিরকুমার, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ। 'বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী : কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬। *গল্পগুচ্ছ* (সংকলন : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম) শিকড় : ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ১৯৯১। *বিদ্যাসাগর*; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, ১৯৯৮। *উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ*, রত্নাবলী : কলকাতা।

বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকনক, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। *কাব্য সাহিত্য মাইকেল মধুসূদন*, এ মুখার্জি এ্যান্ড ব্রাদার্স : কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, সুভাষ, ১৯৯২। *বাংলাভাষা চর্চা*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

ভট্টাচার্য, সুভাষ, ১৯৮৬। *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান*, কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি।

ভট্টাচার্য, সুভাষ (ভূমিকা), ১৯৯৯। *তিষ্ঠক্ষণকাল, বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ।

মজুমদার, বরুন ও ইসলাম, অধ্যাপক নজরুল (সম্পাদনা), ১৯৯৯। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ঢাকা : সাহিত্যমালা।

মিত্র, প্যারিচাঁদ, ২০১৭। আলালের ঘরের দুলাল, আফসার ব্রাদার্স : ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, ১৯৮০। *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*, শিশুসাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা।

সিকদার, সৌরভ, ২০০৪। কথাসাহিত্যের শিল্পরূপ ও ভাষাশৈলী, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী।

সিংহ, শিশিরকুমার, ১৯৯৭। *চলিতভাষার বিবর্তন : উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

সেন, সুকুমার, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১।

সেন, সুকুমার, ১৯৯৪। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ।

সেন, সুকুমার, ১৯৯৩। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ।

Allen, Robert, 2002. *Punctuation.* Oxford University Press. ISBN 0-19-860439-4.

Chelsea, Lee. 2017. *Punctuating Around Quotation Marks*. APA Style. American Psychological Association. Retrieved 16 February.

Clemens, Raymond & Graham, Timothy, 2007. Introduction *to Manuscript Studies,* Ithaca–London: Cornell UP, 84-6

David Crystal, 1995. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language* (London: CUP), p. 207.

Fowler, Henry Watson; Francis George Fowler (June 2002) [1906]. *The King's English.* Oxford University Press. ISBN 0-19-860507-2

Gove, Philip Babcock (edi.), 1957. *Webster's Third New International Dictionary* (Massachusetts, USA : Merriam Company) p. 1843.

Houston, Keith, 2013. *Shady Characters : The Secret Life of Punctuation, symbols and other typographical marks.* W. W. Norton Company: USA

Lallot, J. 1989. La *Grammaire de Denys le Thrace*, Paris : CNRS, pp. 75-6

Parkes, Malcolm Beckwith, 1993. *Pause and Effect : An Introduction to the History of Punctuation in the West.* University of California Press**.** Berkeley : University of California Press, ISBN 0-520-07941-8

Prasoon, Shrikant, 2015. *English Grammar and USAGE*. New Dehli : V & S Publishers. pp. Chapter 6. ISBN 978-93-505742-6-3.

Roy Harris, 1995. *Signs of Writing* (London and Newyork : Routledge) p. 170.

Safra, Jacob E. (chair. of the borad), 1997. *Encyclopaedia Britannica* : Encyclopaedia Britannica, Inc.

Trask, R.L. 1999. *Key Concepts in Language and Linguistics*, New York : Routledge, 1999.

Truss, Lynn, 2004. *Eats, Shoots & Leaves : The Zero Tolerance Approach to Punctuation.* New York : Gotham Books.

Wingo, E. Otha. 1972. "Latin Punctuation in the Classical Age." Janua Linguarum 133